স্নাতক বি.এ, বি.এস.সি, বি.কম
সাম্মানিক ও সাধারণ পাঠ্যক্রমের সকল ছাত্র-ছাত্রিদের জন্য
204-AEC-2

পালঙ্ক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

একটি মানুষের জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা জীবন বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দেশ ভাগ — এসব জড়িয়ে থাকলে তার মনের গঠন বা লেখার প্রেক্ষাপট কেমন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এই মানুষটির জন্ম হয়েছিল ১৯১৬ সালে — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে। কিন্তু সমাজ বা দেশ বা বিশ্ব পটভূমির আপাত প্রতিক্রিয়াকে সরিয়ে শিল্পের মূর্তি কীভাবে নির্মাণ করতে হয়, তাই দেখালেন এই মানুষটি। এক সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজের লেখা সম্বন্ধে বলেছেন 'মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু তা আমাদের গর্বের বস্তু নয়। যেখানে আমরা মহৎ শক্তিমান, সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পাপ আমাকে আকর্ষণ করে না। জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্‌্যবপ্রিয়। তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি। কোন তারুণ্য বা যৌবনের সংস্পর্শ আমার ভালো লাগে এবং ভালো লাগার সূত্র ধরে তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হতে চাই। সখ্যপ্রীতির সম্পর্ক আমায় আনন্দ দেয়। আমি সচেতনভাবে সযত্নে সেই সম্পর্কের অনুশীলন করি। আমার কাছে সেই সম্পর্কও একটি শিল্প।' (ধ্বনি/ মে, ১৯৬৮) নরেন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে জড়িয়ে আছে সমকালীন জীবন, কিন্তু উপস্থাপনায় একেবারে নিজস্ব শৈলীতে দেখিয়েছেন সেই জীবনকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বেশিরভাগ গল্পের গণ্ডীই পারিবারিক জীবন। স্নেহ, প্রেম, কর্তবয়নিষ্ঠা এগুলি তাঁর গল্পের আখ্যান। 'গল্প লেখার গল্প'-এ তিনি লিখেছেন 'নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি, প্রেম, সৌহার্দ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডীর ভিরতে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বারবার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম হয়েছিল ১৯১৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) সদরবি গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন মহেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মা বিরাজবালা দেবী — তবে পালিত হয়েছেন জগৎমোহিনী দেবীর কোলে। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় বন্ধুদের নিয়ে 'আহ্বান' পত্রিকা এবং ভাইদের নিয়ে 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে আই.এ পড়ার সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে 'জয়যাত্রা' এবং অন্য বন্ধুদের নিয়ে 'অভিসার' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পারিবারিক কীর্তন সংগীত সাধনা নরেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য সাধনার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। বঙ্গবাসী কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার সময় ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'মূক' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ওই বছরেই 'দেশ' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় 'মৃত্যু ও জীবন' ছোটগল্প। ১৯৪২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'হরিবংশ' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'দীপপুঞ্জ'। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ 'অসমতল'। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'রস', 'মহাশ্বেতা', 'এক পো দুধ', 'হেডমাস্টার', 'পালঙ্ক' ইত্যাদি। 'পালঙ্ক' ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। 'পালঙ্কে'র প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং গল্পটি আশাপূর্না দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। পরবর্তীতে এই গল্পটিকে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' 'পালঙ্ক' নামে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছিলেন।

গল্পের বিষয় বিশ্লেষণ

‘পালঙ্ক’ গল্পটি পুত্রের বিয়েতে যৌতুক পাওয়া এবং বর্তমানে অব্যবহৃত একটি পালঙ্ক’ বিক্রি করেও ফেরৎ পাওয়ার টানাপোড়েন নিয়ে লেখা। এই টানাপড়েনে উঠে এসেছে দেশ ভাগের যন্ত্রণা। পাকিস্তানে (১৯৪৭-৭১) হিন্দুদের বসবাসের সংকট ও মুসলমানদের অত্যাচার-লুঠপাট-জলের দামে জমি-বাড়ি-আসবাব ইত্যাদি কিনে নেওয়া — আবার বংশ পরম্পরায় মুসলমানদের অবদমিত ক্ষোভ থেকে হিন্দুদের সর্বস্ব দখল করে নেওয়ার অনুচ্চারিত এক আগ্রাসন, আবার হিন্দুদের সাত পুরুষের ভিটের প্রতি শিকড়ের টান — এই টেক্সট ও মেটা টেক্সট নিয়ে ‘পালঙ্ক’ গল্পের আখ্যান গড়ে উঠেছে।

‘পালঙ্ক’ গল্পের কেন্দ্রে আছে দুই পুরুষ — সম্পন্ন ব্রাহ্মণ রাজমোহন রায় ওরফে ধলাকর্তা এবং মকবুল। গল্পের আখ্যান শুরু হয়েছে একটি সিনেমাটিক চিত্র দিয়ে — মকবুল একটি চিঠি নিয়ে ধলাকর্তা বাড়িতে দুধ দিতে এসেছে। ধলাকর্তা তখন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ভিজে পাট মেলে দিচ্ছিলেন। চিঠিতে জল লেগেছে দেখে ধলাকর্তা, মকবুলকে তিরস্কার করতে থাকেন এমনকি ‘কুচক্কুইরা’ বলে গালমন্দ করতে থাকেন। সামন্ততন্ত্রের দাপট ও অভ্যস্ত অভিজাত রক্ত তাঁর দেহে বয়ে চলেছে। নিজের পুত্র-পুত্রবধূ-নাতিনাতনি, প্রতিবেশিরা সকলেই দেশ ছেঁড়ে চলে গিয়েছে, আরও অনেক হিন্দু চলে যাচ্ছে — এসব দেখেও নিজের আভিজাত্য, অহং, আত্মমর্্যাছদা যেন আরও শক্তভাবে আকড়ে রাখতে চান। দেশভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান এখন মুসলমান শাসিত দেশ। বর্ণ হিন্দুরা দেশ ছাড়তে শুরু করেছে, কেবল গরীব নমঃশূদ্রেরা পড়ে থাকছে। যে মুসলমানেরা ধলাকর্তার বাড়িতে কাজ করেছে, আপদে-বিপদে সাহায্য নিয়েছে, সবসময় মানিদের সম্মান দিয়েছে আজ তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। হিন্দুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। এই সুযোগে মুসলমানেরা হাতিয়ে নেয় অথবা জলের দরে কিনে নেয় হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর যাকিছু। বিভক্ত পাকিস্তান মুসলমানদের মুক্ত ক্ষেত্র, হিন্দুদের সাত জন্মের ভিটে আজ বধ্যভূমি — প্রাণ নিয়ে দেশ ছাড়াই অনিবার্্যর।

দেশ ছাড়ার এই নতুন আত্ম-আবিষ্কার ধলাকর্তা জানলেও বুঝতে চান না, মানতে চান না। পয়ষট্টি বছরে পৌঁছে বাস্তব সত্য জেনেও তিনি দেশের জল-মাটি-গাছে শিকড় আকড়ে শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে এই জন্মভূমিতেই মৃত্যুর পরেও যেন মাটিতে মিশে গিয়ে পুনর্জন্ম চান। ছেলে সুরেনের (ডাকনাম বাবু) সমবয়সী এক দেবদারু গাছকে উদ্দেশ করে ধলাকর্তা বলেছে ‘তোর হিন্দু পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাউস নাই। তুই আমার মতোই ভিটেমাটি আকড়াইয়া রইছিস। তোর মতো আপন আমার কেউ না, সংসারে কাউ না।’

ধলাকর্তার ছেলে সুরেন দেশভাগের সম্ভাব্য পরিণতি বুঝে কলকাতায় চলে গিয়েছে। সেখানে একটি ঘরের ব্যবস্থা এবং চাকুরির সংস্থান করেছে। বারবার বাবাকে চলে আসতে অনুরধ করলেও ধলাকর্তা যায়নি — একবার শুধু গিয়ে দেখে এসেছিল। আজ তাঁর পুত্রবধূ অসীমা চিঠি লিখেছে। চিঠির হস্তাক্ষর, লেখার বয়ান এসব যেকোন মুহুরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গর্ব সকলের কাছে জাহির করতে আরও বলেছে অসীমার বাপের বাড়ির আভিজাত্য। অসীমার ঠাকুর-দা অম্বিকা ঘোষ এলাকার শিক্ষিত ও মানী লোক ছিলেন ইত্যাদি। পত্রের শেষের অংশ থেকেই গল্পের সূচনা। অসীমা ছেলেমেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিয়েতে যৌতুক পাওয়া পালঙ্ক — যার ওপর ধলাকর্তার কোন অধিকার নেই এ কেবল অসীমার — বিক্রি করে অর্থ পাঠাতে বলেছে। অসীমার অধিকার প্রকাশ এবং অর্থ চাওয়া — এ যেন ধলাকর্তার লালিত অহংকারে প্রচণ্ড অপমান। ছেলে-বউমার দেশ ছাড়ায় দুঃখ পেয়েছেন, এবার তিনি যেন পৌরুষত্বে আঘাত পেয়ে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বিচলিত হয়ে হিতাহিত বোধশূণ্য হয়ে সেদিনই নগদ অর্থে পালঙ্ক বিক্রি করতে উদ্যত হলেন।

পালঙ্ক বিক্রির এই সুযোগ ধলাকর্তার কামলা-কিষান, দুধের যোগানকারী মুসলমান মকবুল হাত বাড়িয়ে দেয়। ঘরে জমা রাখা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে নগদে মকবুল কিনে নেয় পালঙ্কখানা। যে মুসলমানের দুবেলার খাবার জোটান সংকটের, যার ঘরে লজ্জার বস্ত্রের সংকট — সেই মকবুল সব সঞ্চয় দিয়ে কিনে নেয় পালঙ্ক। হিন্দুর সম্পত্তি এভাবেই জলের দামে কিনেছে মুসলমানেরা। মকবুলের বউ ফতেমা সংসারের কথা বলে বাধা দিলে এই

পালঙ্ক কেনা-কে মকবুল বলেছে ‘পুরুষের ত্যাজ’। এখান থেকেই আপাত একটি গল্পে তৈরি হয়েছে আভ্যন্তরীণ মেটা টেক্সট।

পালঙ্ক নিয়ে মকবুল চলে গেলে এবং মানসিক স্থিরতা ফিরে এলে ধলাকর্তা ভেবেছে তিনি একই করলেন ! তিনি তো ‘মাটিতে ভাত খেলেন। মাটি খেলেন’। না, না একাজ ঠিক হয়নি। ধলাকর্তা পালঙ্ক ফিরে পেতে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন। মকবুল আসল না। ধাক্কা খেল তাঁর অহমিকা। তিনি নিজেই হাজির হলেন মকবুলের বাড়িতে। দেখলেন মকবুলের বাড়িতে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে দারিদ্র্যের ছাপ। না, না এবাড়িতে পালঙ্ক থাকতে পারে না। এই পালংকের সঙ্গো জড়িয়ে আছে তাঁর ছেলে-বউমার জীবনের অনেক মধুর দিন, তাঁর বংশের আভিজাত্য — এই পালঙ্ক উদ্ধার করতেই হবে। ধলাকর্তা, মকবুলকে আরও বেশি পাঁচ টাকা অর্থাৎ পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে পালঙ্ক ফেরৎ দিতে বললেন। কিন্তু না হিন্দুর এই সম্পত্তি হাতছাড়া করা যাবে না, এতো মুসলমানের জয় — পালঙ্ক কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

মকবুলের জাত্যাভিমানকে, মুসলমানের ধর্মরাষ্ট্রকে পুরানো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বা সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী ধলাকর্তা বুঝতে চায় না। নিরীহ প্রতিবেশি নমঃশূদ্রদের ও ছদ্মবেশী-লোভী মুসলমানদের দিয়ে সালিশি সভা বসিয়ে মকবুলকে চাপ দিয়ে ধলাকর্তা তাঁর পালঙ্ক ফেরৎ নিতে উদ্যত হয়। সভায় চৌকিদার ইয়াকুব সাক্ষী দেয় যে ধলাকর্তা নিজে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এই পালঙ্ক মকবুলকে বিক্রি করেছে। সকল মুসলমান অর্থের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছে, কেউ ধলাকর্তার অনুভবকে বুঝতে চায়নি। সকলে দাম কম দিয়েছে বলে জানায় — কিন্তু মকবুল স্পষ্ট বলে দেয় শক্তি যেমন দাম তেমন, তার যা শক্তি ছিল সে তেমনি পঞ্চাশ টাকা দাম দিয়েছে। মকবুল আর কোন টাকা দেবে না, পালঙ্কও ফেরৎ দেবে না — সালিশি সভার মত সে মানবে না। সকল মুসলমান চলে গেলে শরৎ শীল বলেছে - ‘সব মেঞাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা ! তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখের পরে বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইয়া যায়ন। যখন যেমুন তখন তেমুন।’

পালঙ্ক ফিরে পেতে ধলাকর্তা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছে। বিপদের মধ্যেও মকবুল নিজের ইমান নিয়ে পালঙ্ক আগলে রেখেছে। অভাবের দিনে তার স্ত্রী ফতেমাকে বাংলাদেশের এক মমতাময়ী, স্নেহ বৎসল জননী রূপে দেখা যায়, বারবার সে মকবুলকে বুঝিয়েছে পালঙ্ক ফেরৎ দিয়ে সংসারে মান দিতে। ফতেমা বলেছে যে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার কখন কি বিপদ হয়, এসব করা তার ঠিক না। কিন্তু অবদমিত ক্ষমতা, দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ স্বাধীন দেশে হাতে পেয়ে মকবুল কি করে এই হিন্দুর পালঙ্ক ফেরৎ দেয়। মকবুল বলেছে এই পালঙ্ক হল ‘পুরুষের ত্যাজ’ আর সন্তানের কথা ভেবে ফতেমা বলেছে সন্তানদের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই হয় পুরুষত্ব — মা এবং বাবা দুজনের দেখা দুরকম।

আর্থিক সংকটের দিনে ক্ষুব্ধ ধলাকর্তা দুধের যোগান বন্ধ করেছে। পাড়ার অন্যরাও দুধের যোগান নেয়নি। অসহায় মকবুল একসময় বাধ্য হয়ে গোরু, ডিঙি নৌকা বিক্রি করে দিয়েছে। এই সেই গোরু তিন বার বাচ্চা দিয়ে মকবুলের সংসারের হাল টানছিল। সেই গোরু, ডিঙি বিক্রি করে মকবুল কিছু টাকা তার বউয়ের হাতে দিয়েছে আর একটা পুরানো ছোউ দেওয়া নৌকা কিনেছে। নৌকা ভড়ায় খাটিয়ে কিছুদিন সংসার চলল। মকবুল নৌকা ভাড়ায় কয়েক দিনের জন্য বাইরে গেলে প্রতিদিন কাশির ভান করে বাসক পাতা নেওয়ার অছিলায় মকবুলের বাড়ি এসেছে। ফতেমা প্রথম দিনেই পালঙ্ক ফেরতের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু মন মানেনি, তাই ধলাকর্তা রোজ বাসক পাতা নিতে এসে লুকিয়ে পালঙ্ক দেখে গেছে। খোঁচা খেয়ে বাঘ যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ধলাকর্তা তেমনি ফন্দি করে মকবুলের নৌকা চুরি করিয়েছে।

পালঙ্ক কিনতে সর্বস্ব সঞ্চয় খুইয়ে, পালঙ্ক ফেরৎ না দেওয়ায় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে আজ মকবুল অসহায়। অন্যদিকে ধলাকর্তা জ্বর। রক্ত আমাশায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ডাক্তার পরামর্শ দেয় ছেলেকে পত্র লিখে দেশে আসার জন্য। কিন্তু ধলাকর্তা জানায় এখন না, ছেলের একটা প্রমোশন আছে এখন ছুটি নিলে ক্ষতি

হবে। ছেলের মঙ্গল চেয়ে ছেলেকে অসুস্থতার কথা জানায়নি। এসময় চাকর কালু জানায় আতাজদ্দি পালঙ্ক কিনে নিচ্ছে। কালু থিয়েটার দেখতে গেলে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জ্বর গায়ে ধলাকর্তা মকবুলের বাড়ি হাজির হয়েছে। মকবুল হাত ধরে তার মনিবকে ঘরে নিতে চায়। গা স্পর্শ করে দেখে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বউ ফতেমা আলো নিয়ে আসে। এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালা — দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলক তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে'। এক পালঙ্ক প্রেমিক খুঁজেছে বংশ-আভিজাত্য-স্মৃতি, আরেকজন চেয়েছে দমিত অধিকার। কিন্তু আজকের মকবুল পাল্টে গিয়েছে, সে বুঝেছে পালঙ্কের সঙ্গে কী জড়িয়ে থাকে। মকবুল এবার স্ব-ইচ্ছায় পালঙ্ক ফেরৎ দিতে চায়। কিন্তু ধলাকর্তা দেখে পালঙ্কে শুয়ে আছে মকবুলের ছেলে-মেয়ে। ধলাকর্তার চোখে এই শিশু আর কেউ না তার গৃহদেবতা রাধা-গোবিন্দ। 'আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম — দেখলাম আমার রাধা-গোবিন্দরে।' ধলাকর্তা আর পালঙ্ক ফিরে পেতে চায় না। ধলাকর্তা, মকবুলকে বলে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

'পালঙ্ক' গল্পের শেষে একটা মহৎ অনুভব পাওয়া গেল। গল্পকার কলমের আচড়ে যেন দুই ধর্মের সমন্বয়ের এক ছবি এঁকে দিলেন।

'পালঙ্ক' গল্পটিকে ভিন্ন একটি প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে পড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়। তার পাঠে 'আখ্যানটির পুনঃ পুনঃ পাঠের মধ্য দিয়ে একটি মেটা টেক্সট্-এর (Meta Text) সন্ধানও পেয়ে যাই, যেখানে এই উপমহাদেশের দুই বাঙালি সম্প্রদায়ের বিবর্তনের ঐতিহাসিক একটি সত্যের খোঁজ পাওয়া যায়। যদি আমরা 'পালঙ্ক' গল্পটিকে ধলাকর্তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে, মকবুল শেখ ও তার স্ত্রী ফতিমা বিবির চোখ দিয়ে পরিস্থিতি গড়ে পিঠে নিই, বোধ হবে বর্ণ হিন্দুদের চোখে যত ট্র্যাজিকই হোক না কেন, দেশভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনজীবনের পক্ষে আশীর্বাদ। জমি ও জমিদারির দাপটে যুগযুগ ধরে বর্ণহিন্দুর কাছে গরিব মুসলমান সপ্রদায় শোষিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজে বিপুল যে কৃষিশ্রমিক — সকলেই প্রায় গরিব মুসলমান বা নমঃশূদ্র। ফলে শ্রেণি সংঘাত ঐতিহাসিক ভাবেই বর্ণ ও ধর্ম বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বাংলায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে যুগযুগ ধরে বঞ্চনার শিকার হয়ে যে বিপুল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল — তাদের মধ্যে কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে পারেনি। শিল্প গড়ে উঠবার তখন প্রশ্নই ওঠেনা। ভূমির অধিকার থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য-দোকানদারি — সব কিছুই ছিল বর্ণহিন্দু বা অল্পসংখ্যক অভিজ্ঞতা মুসলিমদের হাতে। বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ ও আইনের জোরে বর্ণহিন্দু ও জমিদারদের কাছে সাধারণ প্রজারা ঐতিহাসিক শোষণের শিকার। এটা উত্তরাধিকার সূত্রে বহাল থাকত। তাই বঙ্গভঙ্গের মধ্যদিয়ে ১৯০৫ সালেই মুসলিম মধ্যবিত্ত — সংখ্যায় যারা অতিসামান্য, তৎকালীন আন্দোলনকে ভালো ভাবে দেখেনি। ১৯৪৭ তাদের প্রত্যাশার দ্বিতীয় মস্ত সুযোগ। নিজেদের আইডেন্টিটির স্বপ্নে তাদের বৃহৎ অংশ পাকিস্তান হওয়াটা দোয়া করেছিল। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ, বিদ্যাচর্চা, চাকরি-বাকরি এবং জমিদারি শোষণ (বর্ণহিন্দুদের শোষণ)-এর অবসান ঘটবে দেশভাগের মধ্যে — এ বাস্তবসত্য তাদের চোখে ঐতিহাসিকসত্য। মকবুল শেখের যা আর্থিক অবস্থা, পালঙ্ক কিনবার শখ তার থাকার কথা নয়। ঐতিহাসিকভাবে, অবচেতনে, বর্ণঘৃণা, শ্রেণি ঘৃণা ও যাবতীয় লাঞ্ছনার হিসেব-নিকেষ চুকোবার জন্যই ধলাকর্তার কোনো সম্পত্তি নিজ অধিকারে কব্জা করার মধ্যে, ব্যক্তি মকবুল যেন কিছু পরিমাণ তৃপ্তি অনুভব করেছিল। এই মেটা-টেক্সটে তাদের স্বপ্নভঙ্গের ইঙ্গিত আছে। পাকিস্তান হয়েও মাকবুলদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের কোনো বদল হয়নি। বর্ণহিন্দুরা দলে দলে ওপারে চলে গিয়ে, যে প্রবল সামাজিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, রুজি রোজগারের পুরনো রাস্তা বন্ধ হয়ে, নতুন কিছু প্রবর্তনেরও যে অভাব দেখা দিচ্ছিল, সে-জাঁতাকল থেকে মকবুলরা বেরোতে পারেনি। মনে হয়, এই ক্ষোভ ও স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেই ১৯৭১-এর বাংলাদেশ সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে।

পালঙ্কটি একটি প্রতীক। ওটা ধলাকর্তার পরিবারের সম্পত্তি। ওটা নিজের চালায় টেনে নিয়ে, মকবুল কর্তার দাপট ও অধিকারের ঐতিহাসিক ক্ষোভ, ঘৃণা মেটাতে চেয়েছে। তার পীড়ীত সত্তা যেন জোয়ারের শক্তিতে কিছুটা নাকডলা দিতে পেরেছে বুড়োকে। নইলে, তার মতো হা-ঘরে গরিবের পালঙ্কে শয়ন তো দিবাস্বপ্ন। দেশভাগ, পাকিস্তানের জন্ম মকবুলকে এ-সুযোগ করে দিয়েছে। স্ত্রী ফতেমা স্বামীর অবচেতনের এই বেদনাটুকু ধরতে পারে না। স্বামীর নতুন শখ, তা নিয়ে ধলাকর্তার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, এমন কি মর্মান্তিক কিছু ঘটবার আশঙ্কায় ফতেমা বিচলিত হয়। তার কাছে ব্যাপারটা জটিল বোধ হয়। সে ইতিহাসের সত্যকে সরল সোজাভাবে বুঝতে চায়। 'ফতেমাও সেদিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুমি কি। কেমুন ধারার মানুষ তুমি। এ যদি এক বিঘা জমি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফসল দেবে। এ যদি একটা গাই হইত, বোঝতাম বছর বছর দুধ দেবে ; একটা গাছ যদি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফল দেবে। কিন্তু একখানা শুকনো মরা কাঠ, তা তুমি ঘরে রাইখ্যা মরতে চাও ক্যান ?' ধলাকর্তার পালঙ্কটি ফতেমার কাছে নিছক মরা কাঠ আর মকবুলের কাছে ঐ কাঠে জমা আছে বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি সম্পর্কের ঐতিহাসিক নিষ্পেষণ ও হীনমন্যতার বিরুদ্ধে গোপন ও অপ্রত্যক্ষভাবে সত্তার প্রতিবাদ।

'মকবুল স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, কিন্তু রাগ না করে আসতে আসতে স্নেহকোমল স্বরে বলল, রাখি যে ক্যান মাগী, তা তুই বুঝবিনা। মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মাইছিস, তা তোর বোঝবার কথা না। ও আমার কাছে মরা কাঠ নারে ফতি, ভারি তাজা জিনিস, ও আমার পুরুষের ত্যাজ।' ফতেমা বলল 'এতই যদি ত্যাজ, বাইর হও বাড়ির থিক্যা, চাকরি-বাকরি জোটাইয়া আন। শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান ?' মকবুল সে খোঁজ-খবরও নিয়ে দেখেছে, লেখা জানে না, পড়া জানে না — তাকে কে দেবে চাকরি ? স্ত্রীর কথায় পরম দুঃখে, পরম বৈরাগ্যে মকবুল শুকনো ঠোঁটে একটু খানি হাসল, 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্থানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে।'

নরেন্দ্রনাথ গল্পে অজান্তেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মেটা-টেক্সট্ ধরে তুলে ধরেছেন। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ — শুধু নাম দিয়ে দেশ পরিচয় যে গড়ে উঠেছে, আসলে দেশের সংজ্ঞা কী ? শুধু কি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন নতুন স্বপ্নসৃষ্টি এবং ক্ষমতার জালে তা নাকচ করে দেয়া ? যে-সত্তা মকবুলদের মতো মানুষের অবচেতনে বিমূর্ত হয়ে নানাভাবে প্রকাশের পথ খোঁজে, তার সুস্থ বিকাশ ঘটবার দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের। ভেদ, বৈষম্য, নিপীড়ন মুক্ত একটি সমাজ, যেখানে ব্যক্তির আনন্দ ও মুক্তি এবং গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে — তাই-ই যথাযথ দেশ। বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, রাজনীতিকরা এই সংজ্ঞাকে যে-ভাবেই চিহ্নিত করতে চাক, মকবুল-ফতেমাদের মতো কুশীলবরা জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারে। দেশ ও সমাজের সংজ্ঞা নির্ণয়ই সভ্যতার ইতিহাস। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার নিরিখে সংজ্ঞা নির্ণয়। দেশ খণ্ডিত হচ্ছে — নতুন নতুন নাম সৃষ্টি হচ্ছে — সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার সংজ্ঞা কি আমরা — বাঙালি নির্ণয় করতে পেরেছি ? আজ রাষ্ট্র, প্রদেশ, সমাজ নানা খণ্ডে বিভাজনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যথাযথ কাঙ্খিত সংজ্ঞাটির ঐতিহাসিক সত্য 'পালঙ্ক'র মেটা-টেক্সটই আমাদের কাছে তুলে ধরেছে।